মসলা শিল্প

রপ্তানির সম্ভাবনা ১০০০ কোটি টাকা

আসাদুর রহমান ও সোনিয়া হাওলাদার

বিশ্ববাজারে প্রতি বছর ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন ডলারের মশলা রপ্তানি হয়। পরিমাণ প্রায় ৫ লাখ টন। প্রতি বছর রপ্তানি বাড়ছে ৪ থেকে ৬ শতাংশ হারে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোই এ বাজারের মূল বিক্রেতা। এদের মধ্যে রয়েছে ভারত, মিশর, চায়না, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, তুরস্ক ও ব্রাজিল। অন্যদিকে আমেরিকা, ইউরোপের দেশগুলো, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এ পণ্যের মূল ক্রেতা। প্রতি বছর যে মসলা রপ্তানি হয় তার সিংহভাগ দখল করে রেখেছে ভারত। প্রায় ৪৫ শতাংশ মশলা ভারত রপ্তানি করে।

রপ্তানির এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অবস্থান একেবারেই শূন্যের কোঠায়। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের মসলা রপ্তানি হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশী মসলা বিশ্ব বাজারে খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। দেশের কিছু বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান এ কাজে বিনিয়োগ করছে। তারা অত্যাধুনিক মেশিনে স্বাস্থ্যসম্মত মসলা তৈরি করছে। তাই তাদের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এ খাতে ছোট ছোট বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। কম পরিমাণে হলেও এসব ছোট প্রতিষ্ঠানের মসলা বিশ্ব বাজারে ঢুকে পড়ছে। তাছাড়া মানসম্মত পণ্য তৈরির জন্য দেশের ভেতরই সৃষ্টি হচ্ছে গুঁড়ো মসলার একটি বড় বাজার। তাই গুঁড়ো মসলা দেশের জন্য নতুন একটি শিল্পপণ্য হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটু দেরিতে হলেও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা এখন অনেক বেশি। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ভোক্তাদের আকৃষ্ট করতে গিয়ে পণ্যের মান ও দ্রব্যের দামের মধ্যে সমন্বয় করছে। একই সঙ্গে ভোক্তাশ্রেণীও নির্দ্বিধায় স্বনামধন্য কোম্পানিগুলোর পণ্য গ্রহণ করছে। ভোগ্যপণ্যের মধ্যে রয়েছে চানাচুর, আচার, জ্যাম, জেলি, বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাবার ও গুঁড়ো মসলা। বাচ্চাদের পড়াশোনা, সংসারের নানা ঝামেলা মোকাবেলা করে গৃহিণীরা আর মসলা পেষার সময় পান না। শুধু গৃহিণী নয়, মেসে থাকা ব্যাচেলর যারা রান্না করে খান, তারা সবাই এর সুবিধা ভোগ করছেন। কারণ একটাই, ঝটপট রান্না চাই।

অমৃতলাল ও টাইগার ব্র্যান্ডের হাত ধরে এ দেশে নানা ব্র্যান্ডের গুঁড়ো মসলার আগমন। এছাড়া খোলাবাজারে ব্র্যান্ডহীন গুঁড়ো মসলাও পাওয়া যেত। তখন মরিচে ইটের গুঁড়ো, ধনিয়ায় গোবর গুঁড়ো ব্যবহার করা হতো বলে ধারণা করা হয়। পরে অবশ্য পরীক্ষায় তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, বাজারে এসেছে রাঁধুনী, প্রাণ, ফ্রেশ, বিডি, আরকু প্রভৃতি মসলা কোম্পানি। মানুষ এখন অনেক স্বাস্থ্য সচেতন। আর তাই মানগত দিক থেকে ভালো না হলে ভোক্তা পণ্যটি কিনবে না। মসলায় স্বাদ, গন্ধ, রঙ সবকিছুই ঠিক থাকতে হবে। এই তিনটি বিষয়ে এবং স্বাস্থ্যমানের দিক থেকে যারা এগিয়ে তারাই এখন বাজার দখল করে রয়েছে। মসলার গুণগত মান সম্পর্কে রাঁধুনী ব্র্যান্ডের বাজারজাতকারী স্কয়ার কনজ্যুমার প্রডাক্টস লিঃ-এর পরিচালক এস কে দাস সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য মসলার কাঁচামাল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। সঠিক বীজ নির্ধারণ, সার প্রয়োগ এবং কাঁচামাল সংরক্ষণে ময়শ্চার লেভেল ঠিক না রাখলে গুণগত মান নষ্ট হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, মসলায় ভোলাটাইল অয়েল নামক উপাদানটি সঠিক তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা। মসলা ভাঙানোর মেশিন এ ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, 'আগে মসলা গুঁড়ো করার জন্য প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। এতে বেশি তাপমাত্রায় মসলার মান নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এখন বড় কোম্পানিগুলো বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে। মূলত জার্মানি, হংকং, ভারত থেকে যন্ত্রপাতি আনা হয়। এছাড়া প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমেও গুণগত মানে পার্থক্য আসে। অ্যালুমনিয়ামযুক্ত তিন স্তরবিশিষ্ট এয়ারটাইট প্যাকেটে ১ বছর পর্যন্ত মসলার মান অক্ষুণ্ন থাকে।'

একটা সময় ছিল শুধু ব্যাচেলররাই মেসে রান্নার জন্য গুঁড়ো মসলা ব্যবহার করতো। কিন্তু এখন সমাজের নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবাই গুঁড়ো মসলা ব্যবহার করছে। যার যার সাধ্যমতো, গুণগত মান ও সাশ্রয়ের কথা ভেবেই মানুষ বিভিন্ন কোম্পানির গুঁড়ো মসলা ব্যবহার করে। বড় কোম্পানিগুলো তুলনামূলকভাবে মসলার দাম একটু বেশি রাখে। কিন্তু মসলার মান, সাশ্রয় ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে শহুরে ভোক্তাদের এসব মসলার প্রতি আগ্রহ বেশি। তবে ধীরে ধীরে গ্রামেও গুঁড়ো মসলা কেনার প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। কারণ গ্রামের অনেক মহিলাই এখন কর্মজীবী। সামান্য বেশি খরচ হলেও ভালো জিনিসটা কেনার আগ্রহ সবারই।

বাংলাদেশে গুঁড়ো মসলা শিল্পে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি এখন ছোট প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসছে। কম পুঁজি বিনিয়োগ করে এরা বাজারে আসছে বলে রাঁধুনী, আরকু, বিডি, ফ্রেশের মতো এসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন আমরা দেখতে পাই না। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রচুর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সরকারি তরফ থেকে তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না এসব প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এরপরও থেমে থাকে না। এসব প্রতিষ্ঠান নামী-দামি প্রযুক্তি প্রথম থেকেই ব্যবহার করতে পারে না। তবুও মসলার মান যতোটা সম্ভব ঠিক রেখে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট।

মসলা শিল্পে একটা সময় ছিল যখন অমৃতলাল, টাইগার ব্র্যান্ড এগুলো শুধু দেশীয় চাহিদা পূরণ করতো। কিন্তু এখন বিশ্বের নানা দেশে বাংলাদেশীরা বসবাস করে। তাই এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও মসলার চাহিদা বেড়েছে। যেকোনো কোম্পানিরই এখন এ শিল্পে বিনিয়োগ করার একটা প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করা। রপ্তানির দিক দিয়ে রাঁধুনী বর্তমানে এগিয়ে আছে। তারা ২০০২ সাল থেকে মসলা রপ্তানি করছে। রাঁধুনী ভারত, মিয়ানমার, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, দক্ষিণ

কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় মসলা রপ্তানি করছে। প্রতিটি দেশেই মাসে অন্তত এক-দুটি কন্টেইনার মসলা পাঠানো হয়। পাশাপাশি বিডি ২০০৪ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, আবুধাবি, কুয়েত, লেবানন, প্যারিস, লন্ডন, স্পেন কানাডায় মসলা রপ্তানি করছে। প্রাণ গুঁড়ো মসলা বিশ্বের ৫০টি দেশে মসলা রপ্তানি করছে। এছাড়া আরকু, রবি মসলা বিদেশে তাদের মসলার নমুনা পাঠিয়েছে।

দেশীয় বাজারে BSTI অনুমোদিত হলেই মসলা বিক্রি সম্ভব। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিদেশের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে যদি মূল টার্গেট হয় বাংলাদেশী, তবে সে ক্ষেত্রে খুব বেশি অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে দেশের স্থানীয় বাজারে প্রবেশের জন্য বেশকিছু ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়।

এসব সার্টিফিকেট থাকলেও প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে মসলা পরীক্ষা করে। এরপর তাদের বাজারে ঐ কোম্পানির মসলার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, ভারতীয় মসলার চাইতে স্বাদ, গন্ধে এ দেশের মসলা অধিক মানসম্পন্ন। তাছাড়া এ দেশের মসলা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মসলা দেশের বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থান থেকে সংগ্রহ করে। এ প্রসঙ্গে বিডি ফুডস্ লিঃ-এর ব্র্যান্ড অফিসার কামরুল ইসলাম চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, আমরা যশোর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর থেকে মরিচ সংগ্রহ করে। হলুদ আর ধনিয়া আনি দক্ষিণবঙ্গ থেকে। কারণ এসব স্থানে ভালো মানের এসব মসলা পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে মসলার ব্যাপক চাহিদার কারণে প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বিশ্বে মসলা শিল্পে ভারত অনেক এগিয়ে। যদিও ভারতের তুলনায় আমাদের দেশী মসলা গুণগত দিক দিয়ে অনেক উন্নত। তবুও আমরা ভারত থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর প্রধানতম কারণ হলো, অনেক আগে থেকে তারা মসলা রপ্তানি করছে। তাছাড়া সরকার সেসব দেশের রপ্তানিকারকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়। এ বিষয়ে লালমাই ফুড প্রোডাক্টস লিঃ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজার মাসুদ রানা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ভারত মসলা বাণিজ্যে এগিয়ে থাকার পেছনে কারণ হলো, তারা খুব সস্তায় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি পাচ্ছে। বাইরে থেকে কোনো কিছু আমদানি করতে হচ্ছে না। ফলে অনেক কম মূল্যে তারা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতে পারছে। সেখানে আমাদের খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। কারণ আমাদের যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি সবই আমদানি করতে হয়। কাঁচামাল দেশের ভেতরেই সংগ্রহ করতে পারি। শুধু জিরা ইরান ও ভারত থেকে আমদানি করতে হয়।

রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ছোট কোম্পানিগুলোও আন্তর্জাতিক বাজার ধরার চেষ্টা করছে। প্রথমে নমুনা হিসেবে কিছু মসলা নানা দেশে পাঠাতে হয়। এরপর মসলার মান, স্বাস্থ্যগত দিক, দাম- এসব দিক লক্ষ্য রেখে যারা আগ্রহী তারা ঐ কোম্পানিকে অর্ডার দেয় এবং এভাবে এগিয়ে চলে বাণিজ্য। আগে মসলা কনটেইনারগুলো জাহাজে পাঠানো হতো, এখনো হয়। তবে দ্রুত পাঠাতে প্লেন ব্যবহার করা হয়। সরকারি নীতি অনুযায়ী মসলা রপ্তানিকারকদের ইনসেনটিভ দেয়া হয় কিন্তু তা পাওয়া কঠিন। এসব কারণে ছোট কোম্পানিগুলো বেশ পিছিয়ে থাকে। কিন্তু তবুও তারা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলছে রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে। বাংলাদেশে মসলা বাণিজ্যে রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। ২১ শতকের প্রথম থেকেই এ বাণিজ্যে নতুন নতুন কোম্পানি যোগ দিচ্ছে! এ প্রসঙ্গে মাসুদ রানা ২০০০কে বলেন, বর্তমানে বছরে মসলা আদান-প্রদান হচ্ছে মাত্র ১০ কোটি টাকার। কিন্তু বছরে ১ হাজার কোটি টাকার মতো মসলা রপ্তানি করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে, তবেই এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর প্রায় ৩০০% হারে শুধু রাঁধুনী কোম্পানিরই রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। গত বছর দেশের মসলা রপ্তানির প্রায় ৭৩% চাহিদা রাঁধুনী পূরণ করতে পেরেছে। সঙ্গে নতুন কোম্পানিগুলোর রপ্তানির পরিমাণও বেড়েছে। এ দেশের মসলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সেখানে চাহিদাও বাড়ছে। তাই রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের জন্য এ মুহূর্তে প্রয়োজন দেশে আরো কিছু ছোট-বড় মানসম্পন্ন মসলা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা। এ ক্ষেত্রে নতুন কোম্পানিগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া এসব ভোগ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা অনুমতি পেতে যে হয়রানির মুখোমুখি হয় তার সমাধান প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিদেশের বাজারে এ দেশের মসলার বাজার খুঁজে বের করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের হাইকমিশন বা দূতাবাসগুলো সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

মসলা এ দেশের রপ্তানি খাতে একটি অপ্রচলিত পণ্য। রপ্তানির ক্ষেত্রে এর অবস্থান খুবই সামান্য। কিন্তু রয়েছে বিশাল সুযোগ। সুষ্ঠুভাবে এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে মসলা বাংলাদেশে একটি বড় রপ্তানি পণ্যে পরিণত হতে পারবে।

আপনিও শুরু করতে পারেন গুঁড়ো মসলার ব্যবসা

মানের দিক থেকে যদি কোনো আপস না করেন তবে স্থানীয় বাজারে খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়ে যাবেন। একই সঙ্গে হতে পারেন গর্বিত রপ্তানিকারক। এর জন্য আপনার বিশাল পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। ১২-১৫ লাখ টাকা বিনিয়োগে আপনি এ ব্যবসা শুরু করতে পারেন। যেমন রবি ফুডস লিমিটেড। কোনো প্রচার-প্রচারণা ছাড়াই শুধু গুণগত মানের ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে স্থানীয় বাজার দখল করে নিচ্ছে। বিভিন্ন দেশেও প্রতিষ্ঠানটি তাদের পণ্যের নমুনা পাঠাচ্ছে এবং ভালো সাড়া পাচ্ছে।

রবি ফুডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক 'এইচ কে সাধু বলেন, এ ব্যবসায় যারা আসতে আগ্রহী তাদের ১৫ লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে নামতে হবে। প্রতিটি মসলা গুঁড়ো করার আগেই ভালো মসলা বাছাই, ভালো করে শুকানো হয়েছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গুঁড়ো করতে প্রতিটি মসলার জন্য আলাদা ক্র্যাশিং মেশিন ব্যবহার করা উচিত। কারণ এতে মসলার রঙ, গন্ধ, মান ভালো থাকে। এরপর চালুনি দিয়ে ছেঁকে প্যাকেটজাত করতে হয়। প্যাকেটজাত করার জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করা ভালো। তবে ১৫, ৫০ ও ১০০ গ্রাম প্যাকেটের জন্য আলাদা আলাদা মেশিন ব্যবহার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের মেশিন ব্যবহার করা যায়। প্রথমে গুণগত মান দ্বারা ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতেই হবে, নতুবা বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব। রবি মসলা সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে ১০০ কেজি মসলার অর্ডার পেয়েছে।

'গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য মসলার কাঁচামাল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, মসলায় ভোলাটাইল অয়েল নামক উপাদানটি সঠিক তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা'

এস কে দাস
পরিচালক, রাঁধুনী ব্র্যান্ড স্কয়ার কনজ্যুমার প্রডাক্টস লিঃ